ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের প্রতি একটি জরুরী আবেদন

রণেশ মৈত্র

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্র সংগঠন, ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে ইতোমধ্যে দু'বার মুখ খুলেছেন। তাঁর প্রথমবারের কথাটি ছিল ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যকলাপ কিছুকাল স্থগিত রাখার জন্য আবেদনমূলক প্রস্তাব। এই বক্তব্য সমর্থন পেয়েছিল সীমিত পরিসরে। কিন্তু বেশির ভাগই, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ভাষ্য ছিল তাঁর বক্তব্যের সমালোচনায় মুখর। এই সমালোচনা যাঁরা করেছিলেন; তাঁদের মধ্যে ছিল ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ এবং কিছু রাজনৈতিক নেতাও।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি আর একটি আবেদন জানিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত ছাত্রসংগঠনগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। অর্থাৎ ছাত্র সংগঠনগুলো স্বাধীনভাবে, কোন দল বিশেষের লেজুড় বৃত্তি না করে, কাজ করুক। এই দ্বিতীয় আবেদনটির কোন সমালোচনা আজও আমার চোখে পড়েনি। যাঁরা প্রথম বক্তব্যের সমালোচনা করেছিলেন তাঁরা এবারও সমালোচনা করবেন বলেই আমার ধারণা ছিল। কিন্তু না, তাঁরা এমন কিছু করলেন না। আবার রাষ্ট্রপতির এই দ্বিতীয় বক্তব্যের প্রতি কোন সমর্থন জ্ঞাপক বক্তব্যও আমার নজরে আজতক পড়েনি।

সে যাই হোক, আমি রাষ্ট্রপতির এই দু'টি আবেদনের প্রেক্ষিতে একথা নির্দ্বিধায়ই বলতে পারি যে, ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলোর এ সংক্রান্ত নীতি তাঁকে গোটা দেশবাসীর মতোই ভাবিয়ে তুলেছে এবং যে কারণেই তিনি যখন যা ভাবছেন তা অকপটে জাতির সামনে তুলে ধরছেন। রাষ্ট্রপতি তথা রাষ্ট্র প্রধান, বিচারপতি, সাহাবুদ্দীন আহমদ একজন সংবিধান-বিশেষজ্ঞ, একজন অতীব দায়িত্বশীল নাগরিক এবং গোটা জাতির কাছেই অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁর সকল গুরুত্বপূর্ণ উক্তিই জাতির সচেতন অংশকে আন্দোলিত করে– অন্ততপক্ষে ঐ সচেতন অংশের চিত্তকে! আলোড়িত করে।

বস্তুত বাঙালী জাতির জাতীয় ইতিহাসের এক অতীব গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে অতীতে আমাদের দেশের ছাত্র সমাজ, ছাত্র-আন্দোলন ও সংগঠনের গঠনমূলক রাজনৈতিক ভূমিকার মাধ্যমে। ইতিহাসের নানা প্রেক্ষিতে তাদের সাহসী ও দেশপ্রেমিক ভূমিকার মাধ্যমে আমাদের ছাত্র সংগঠনগুলো যে গৌরবজনক আন্দোলন জাতিকে উপহার দিয়েছে তা এক কথায় অবিস্মরণীয়। তাই এ বিষয়টি আবেগমুক্ত নয় এবং যথেষ্ট স্পর্শকাতরও বটে।

এতদসত্ত্বেও, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আজকের নতুন প্রজন্ম এক কঠিন দুঃসময়ের মুখোমুখি। দেশের শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্র সমাজ, বর্তমান ও নতুন প্রজন্ম তথা বর্তমান ও আগামী দিনের বাংলাদেশ এক জটিল ও কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত। শিক্ষাঙ্গনের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের ধারায় আগামী প্রজন্মের নিরাপদ ও বিকশিত জীবন নিশ্চিত করার অপরিহার্য বিষয়টি আজ এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অথচ এক অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ ও রক্ত বিসর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখ লাখ পরিবার অংশ নিয়েছে, অকাতরে দেহের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। তাদের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ছিল যা আমরা ভুলতে পারি না।

একবিংশ শতাব্দী আজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত এক সুকঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। এই চ্যালেঞ্জের স্বার্থক মোকাবিলার ওপরই নির্ভর করবে আমাদের সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রকৃত ও সার্থক বাস্তবায়ন। তাই এ মুহূর্তে আমাদের জরুরী চাহিদা হলো শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ রচনা।

আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের নতুন প্রজন্মও কম্পিউটারও উপগ্রহের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সর্বাধুনিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। বিরাজমান জরাজীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার হবে। প্রণীত হবে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি, শিক্ষাঙ্গনসমূহ হবে সন্ত্রাস ও ভীতিমুক্ত, ছাত্ররা বড় বড় রাজনৈতিক দলের ছাত্র নামধারী সশস্ত্র ক্যাডারের হাতে জিম্মি হয়ে থাকবে না, উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন হবে সম্পূর্ণ সন্ত্রাসমুক্ত। জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সন্ত্রাসমুক্ত এবং আইনের শাসন নির্ভর একটি সুশীল সমাজ গড়ে তোলা হবে। কিন্তু বাস্তবে তা আজও ঘটল না– অসংখ্য সংগ্রামী মানুষের অজস্র রক্তধারায় গোটা জাতি স্নান করার পরেও না।

স্বাধীনতার পরে, বিশেষত ১৯৭৫ আগস্ট পরবর্তীকালে স্বনামে-বেনামে সামরিক স্বৈরাচারী শাসক শিক্ষাঙ্গনসমূহে সন্ত্রাস লালন করেছে, অস্ত্রের ঝনঝনানি সৃষ্টি করেছে, দলীয় রাজনীতির নামে ছাত্র সমাজের মধ্যে বিভেদ ও সন্ত্রাসকে বেগবান করেছে। এছাড়াও, ১৯৭৬ সালে তৎকালীন সামরিক শাসক এক সামরিক ফরমান বলে ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হতে বাধ্য করেছে এবং গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে যে, এর ফলশ্রুতিতে কার্যত ছাত্র রাজনীতিই ছাত্র সমাজের হাতছাড়া হয়ে নানা দলের নানা নেতা ও গোষ্ঠীনির্ভর হয়ে পড়েছে। উপরতলার নির্দেশে ছাত্র-সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব অছাত্রও পেশাদারদের হাতে হস্তান্তরিত হয়। এভাবে ছাত্রদেরকে দলীয় রাজনীতিতে ব্যবহারের ফলে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোও হয়ে পড়ে ছাত্র সংগঠননির্ভর-পেশীশক্তিনির্ভর। ফলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস হয়ে হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য, হল দখল, সীট দখল, সংসদ দখল, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারের কমিশন আদায়– এই জাতীয় নোংরা ক্রিয়াকলাপই হয়ে ওঠে ঐ সকল বৃহৎ রাজনৈতিক দলের পোষা ছাত্র নেতাদের মূল কার্যকলাপ। এর সাথে যুক্ত হয় দলীয় আন্তঃ লড়াই আঞ্চলিকতা, অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং নেতৃত্ব ও আধিপত্যের দ্বন্দ্ব।

অপরদিকে মৌলবাদ নির্ভর এক ধরনের ফ্যাসিবাদ, ধর্মের নামে হত্যা, রগকাটা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী উগ্র সাম্প্রদায়িক মহল শিক্ষার পরিবেশকে ধ্বংসের কাজে মেতে ওঠে। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সমাজের মধ্যে দলীয় রাজনীতির নামে বিভেদ ও সন্ত্রাস এবং মৌলবাদী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যার ফলে শত শত তরুণের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে, আহত ও পঙ্গু হয়েছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। শিক্ষাঙ্গন তার সকল পবিত্রতা হারিয়ে অঘোষিত অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছে। ছাত্র-

> *আজকের নতুন প্রজন্ম এক কঠিন দুঃসময়ের মুখোমুখি। দেশের শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্র সমাজ, বর্তমান ও নতুন প্রজন্ম তথা বর্তমান ও আগামী দিনের বাংলাদেশ এক জটিল ও কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত। শিক্ষাঙ্গনের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের ধারায় আগামী প্রজন্মের নিরাপদ ও বিকশিত জীবন নিশ্চিত করার অপরিহার্য বিষয়টি আজ এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অথচ এক অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ ও রক্ত বিসর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।*

ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারাও হয়ে পড়েছেন নিরাপত্তাহীন। শিক্ষার মান হচ্ছে ক্রমাগত নিম্নমুখী। ফলে প্রতিবছর হাজার হাজার প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্র-ছাত্রী, যারা মূল্যবান জাতীয় সম্পদে পরিণত হতে পারত দেশত্যাগ করে চলে যাচ্ছে এক প্রচণ্ড ক্ষোভে ও হতাশায়।

১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী ঐতিহাসিক বিজয়ের পর প্রয়োজনীয় ও প্রত্যাশিত ছিল সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার। তা সম্ভব হলে অর্জিত গণতন্ত্র শক্ত এক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারত এবং গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা এক নতুন গতিবেগও পেতে পারত। কিন্তু জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট অঙ্গীকার রেখেও তা ভঙ্গ করল নির্বাচিত বিএনপি সরকার। দেখা গেল, শিক্ষাঙ্গনের নানা ক্ষেত্রে নিজ নিজ দখল বজায় রাখার সুতীব্র প্রয়াস। সন্ত্রাস বন্ধের কোন উদ্যোগই নেয়া হলো না। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো। আজ তাদের ক্ষমতায় আসার এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। তারা ঘোষণা করেছিল ক্ষমতায় এলে তাদের এক নম্বর কাজই হবে সন্ত্রাস বন্ধ করা। দেখা গেল, তারাও তাদের দল থেকে সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করা তো দূরের কথা, তারা সাবেক সরকারী দলের সন্ত্রাসীদের সাদরে নিজ দলে ঠাঁই দিচ্ছে। সন্ত্রাসীদের সাহস ফলত বেড়েছে এবং দেশ নতুন করে সন্ত্রাসে ছেয়ে গেছে। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসও চলছে অব্যাহত গতিতে নানা পথে, নানা কৌশলে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের সর্বনাশা পরিণতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে উঠেছে বহু পূর্বেই। রাজনীতিবিদরাও প্রকাশ্য ও পরোক্ষভাবে একথা স্বীকার করলেও তাঁরা, বিশেষত চারটি বড় দলের নেতা-নেত্রীরা, এখনও দলীয় রাজনীতির উর্ধে উঠে ছাত্র নামধারী পেশাদার সন্ত্রাসী শক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারছেন না, তা করতে চাইছেও না বরং তাঁরা সবাই নিজ নিজ অঙ্গীকারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সন্ত্রাসীদের নির্লজ্জভাবে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। ফলে, প্রচলিত ছাত্র সংগঠনগুলো, পরম দুঃখের সাথেই বলতে হয়, তার সকল 'মান-ইজ্জত' এবং জনগণের কাছে বিশ্বস্ততা পুরোপুরি খুইয়েছে। ছাত্র নেতারা আজ জনগণের স্নেহ বা শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে পরিগণিত না হয়ে ভীতির পাত্রে পরিণত হয়েছে। তেমনি তারা যেহেতু রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসাবে কাজ করছে, তাই রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাঙ্গনের এবং সমাজের ব্যাপক সন্ত্রাসের জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত হচ্ছেন এবং জনগণের কাছে তাঁদের বিশ্বস্ততা মারাত্মকভাবে ভাংচুর হয়ে যাচ্ছে।

অথচ এই ছাত্র সমাজই অতীতে, বহু গৌরবময় ঐতিহ্য ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মাতৃভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির ওপর পাকিস্তানী হামলাকে জীবন দিয়ে রুখেছে। শিক্ষা-সংকোচনের নানাবিধ চক্রান্ত প্রতিহত করেছে। সামরিক শাসনকে বারবার হটিয়েছে। এই ছাত্র সমাজই বাঙালী জাতির ওপর বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া, প্রতিটি স্বৈরাচারী সরকার উৎখাতের সংগ্রামেও ছাত্র সমাজ গৌরবময় অবদান রেখেছে।

ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনের আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস, ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্র সমাজের গণসংগঠন হিসাবেই জন্ম নিয়েছিল। কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড় বা অঙ্গ সংগঠন হিসাবে নয়। ছাত্রলীগের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৮ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের (যার পরবর্তী নাম আওয়ামী লীগ) জন্মের এক বছর আগে। ছাত্রলীগের মেনিফেস্টো বা গঠনতন্ত্রে তা কারও অঙ্গ সংগঠন বলে লেখা ছিল না। জন্মের পর আওয়ামী মুসলিম লীগ বা পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো বা গঠনতন্ত্রেও এমন কোন কথা লিখিত ছিল না। এ ঘটনা প্রথম ঘটে বাকশাল গঠন কালে এবং পরবর্তীতে ১৫ আগস্টে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর জিয়াউর রহমানের সামরিক আইনে প্রণীত পিপিআর-এ বাধ্যতামূলকভাবে ছাত্র সংগঠনগুলোকে কোন না কোন দলের অঙ্গ সংগঠনে পরিণত করা হয়। ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম হয়েছিল ১৯৫২ সালে কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড় বা অঙ্গ সংগঠন হিসাবে নয়, পুরোপুরি ছাত্র-গণ সংগঠন হিসাবে। বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টি এই সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নিলেও তারা ছাত্র ইউনিয়নকে নিজস্ব অঙ্গ সংগঠন হিসাবে দাঁড় করায়নি কদাপি। ছাত্র ইউনিয়নের ঘোষণাপত্র মেনে নিয়ে যে কোন সমমনা রাজনৈতিক দলের কর্মী বা সমর্থকই ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হতে পারতেন। ১৯৫৭ সালে ন্যাপের জন্মের পর তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্তবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কর্মসূচী স্বভাবতই ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বকে ন্যাপের প্রতি আকৃষ্ট করে।

(চলবে)

তারিখ ... 10 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...